হাসান আজিজুল হক

বাংলাদেশ : পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়

একাত্তর সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা এসে গেলে তার পরের তিন মাস জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চের মধ্যে আমি বেশ কটি গল্প লিখেছিলাম। তৈরি করে গল্প আমি কোনোদিনই লিখতে পারি না। আপন ভাবনা চিন্তা উদ্বেগ আশা মিলিয়ে কিছু বক্তব্য থাকলে যেমন কেউ প্রবন্ধ লেখে, আমিও প্রায় একই উদ্দেশ্যে গল্প লিখি। স্বাধীনতার পরে পরে আমার যা মনে হচ্ছিল, আমার যে অভিজ্ঞতা জমেছিল আর যে অভিজ্ঞতা হচ্ছিল আমি তাই মানুষজনসহ মানুষের সংসারের ছবি এঁকে সবাইকে জানাতে চেয়েছিলাম। দুটি নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা আমি এই সময়ে লিখি, দুটি গল্পের ভিতর দিয়ে। সে পুরোপুরি আমার নিজেরই কথা। মুক্তিযুদ্ধের ন-মাস আমি দেশের মধ্যেই আটকা পড়েছিলাম, এদিক-ওদিক সরে যেতে গিয়ে বুঝতে পারি কী ভীষণ নিষ্ঠুর সর্বাত্মক মারণযজ্ঞের পাকা ব্যবস্থা হয়ে রয়েছে দেশের মধ্যে। দখলদার পাকিস্তানিরা দেশের সমস্ত শেয়াল কুকুর হায়েনাদের জড়ো করেছে, শকুনরা চক্কর দিচ্ছে মাথার উপর। শিগগির আমি বুঝতে পারি, ছুটোছুটি করে হঠাৎ মৃত্যুর মুখে না পড়ে বরং স্থির সংকল্প নিয়ে তার মুখোমুখি হওয়াই ভালো। আমি ফিরে এসে মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ দীর্ঘ দিনগুলি নীরব প্রতীক্ষায় কাটিয়ে দিই। এই অভিজ্ঞতা আমার মতো অনেকেরই হয়েছে, কিন্তু আমার মতোই কেউ তা বর্ণনা করতে পারবেন না। একইভাবে, মুক্তি যখন এল ১৬ ডিসেম্বরে, সেই অভিজ্ঞতাও কেউ বর্ণনা করতে পারবেন বলে মনে হয় না। যদি কোটি মানুষের শোক আমি আমার এই বুক থেকে খালাশ করে দিতে পারতাম, যদি পুরো একটি আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতে কষ্টের শোকের ক্ষোভের ক্রোধের আক্রোশের উচ্ছ্বাস আমার একার বুক ফাটিয়ে বেরিয়ে আসতে পারত, যদি লক্ষ মানুষের অশ্রু আমার দুখানি চোখ থেকে মুক্তি পেত, তাহলে হয়তো খানিকটা ন-মাসের অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো যেত। কিন্তু কিছুই করা গেল না, ১৬ ডিসেম্বর এসে গেল, কারো নতুন হাত পা মাথা কিছুই গজাল না, দৈনন্দিন প্রতিটি কাজই করতে

হল শান্তভাবে। তবে সত্যিই চুপ করে থাকতে পারিনি। ক্ষোভ দুঃখ যন্ত্রণা আনন্দ আকাঙ্ক্ষা জীবনপ্রেম এক সঙ্গে রান্না হতে লাগল মনের মধ্যে। ফুটতে লাগল টগবগ করে।

দারুণ অভিজ্ঞতার কয়েকটি গল্প লিখেছিলাম এই সময়। কিছুই হয়নি। একজন চাষি ভূষণ হাটে গিয়েছিল ছেলের খোঁজে। পাজি অলস ছেলেটিকে সে পেটাতে পেটাতে বাড়ি নিয়ে আসবে। তার দেখা যখন সে পেল তখন বন্দুক চালু হয়ে গেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট এসে ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে মানুষের প্রাণ। রাগে অন্ধ ভূষণ যখন এগিয়ে যাচ্ছে ছেলের দিকে, ছেলেও এগিয়ে আসছে বাপের দিকে, কিন্তু কেউ কারো কাছে পৌঁছুতে পারে না, ছেলের প্রাণহীন দেহ গড়িয়ে পড়ে বাপের পায়ের কাছে। বাপকেও সইতে হয় না মরণাধিক যন্ত্রণা। আর একটি বুলেট এসে চুরমার করে দেয় তার হৃৎপিণ্ড। ন-মাসে এরকম ঘটনা কত ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই। আমার সাধ্য কী, এমনকী একটিমাত্র মানুষের যন্ত্রণার পরিমাপ করি! কষ্ট কখনো কখনো কঠিন বস্তুময় হয়ে ওঠে, তাকে ওগরাতে গেলে তখন স্নায়ুপেশি ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। ১৬ ডিসেম্বরের পরে লেখা আমার গল্পগুলি ছিল এইরকম কঠিন বস্তুপিণ্ড ওগরানোর চেষ্টার মতো। এসব লেখা আদৌ সাহিত্য কিংবা গল্প কিনা আমি জানি না। যে লোকটি আলোয়-অন্ধকারে শহরের গলিঘুঁজির ভিতর দিয়ে সাপের মতো বুকে হেঁটে বেড়ায়, বড় রাস্তায় কেবলই জিপ চলে, পাকিস্তানি বাহিনীর লোকেরা অকথ্য নির্যাতনে মানুষ মারে, লোকটি ঢুকে পড়ে নিজের বা যে কারো বাড়িতে, উঠোনে গিয়ে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করে, পায় পাঁজরের অস্থি, শিশুর কচি করোটি, দীর্ঘ কালো চুলের রাশি, সে লোকটি তো আমিই। ন-মাসের স্মৃতি অভিজ্ঞতা এমনি করেই লিখে রাখার চেষ্টা করি। মোটেই গল্প লিখি না।

এসব লেখার সময়েই ঘটতে থাকে আরো ঘটনা। জানুয়ারি মাসে ফিরে আসেন শেখ মুজিবর রহমান। দেশের সমস্ত মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে; শহর-নগর, গ্রাম-গঞ্জের পথ ঘাট হাট বাজার মানুষে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সারা বাংলাদেশ তখন কাচের পাত্রের মতো ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। ভাঙা শামুকের খোলের মতো চূর্ণ চূর্ণ ছত্রখান। হাওয়ায় উড়ন্ত সব সেতু; ছোটবড় ব্রিজ কালভার্টের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর নানা দেশ থেকে বাংলাদেশের স্বীকৃতি আসতে থাকে, পাকিস্তানি সৈন্যদের যুদ্ধবন্দী করে নানা ক্যাম্পে আটকে ফেলা হয়, নতুন নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া হয়, সারা পৃথিবীর নজর পড়ে বাংলাদেশের উপর। শকুনদের নজরও পড়তে শুরু করেছে তাও টের পাওয়া যায়। এদিকে দেশের সমস্ত গর্ত রাজাকার আলবদরে ভরে যায়। তাদের কাউকে আর মাটির উপরে দেখা যায় না। প্রতিশোধের আগুন নেভাতে কারা যে তাদের যেখানে সেখানে মেরে ফেলছিল! ধর্ষণকারী খুনিদের শিকড়সুদ্ধ উপড়ে

ফেলো, আইনের অপেক্ষায় থাকার কোনো দরকার নেই। কে সইবে বোনের ধর্ষণকারী, মায়ের হত্যাকারী, পিতার খুনিকে? গ্রামকে গ্রাম আগুন জ্বালিয়ে ছারখার করে দিয়েছে যে তার শাস্তির জন্য আইনের দিকে চেয়ে কীসের অপেক্ষা? আবার রক্ত ছুটতে শুরু করল। চেনা বহু লোকের চরম শাস্তির খবর পাই। মনে নেই, তবে সাধারণ ক্ষমাটা বোধহয় এই সময়েই ঘোষণা করা হয়।

আশ্চর্য ক্ষমতায় বাংলাদেশের মানুষ আত্মসংবরণ করে। যে আবেগে লড়েছিল সেই আবেগেই রক্তপাত বন্ধ করে দেয়। যারা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল অস্ত্র নামিয়ে রাখে তারা। বেতনভুকরা ছেড়ে দেয় তাদের বেতনের একাংশ। আশার জোয়ার, আকাঙ্ক্ষার উতরোল, উদারতার উদ্দাম তরঙ্গ রোদভরা দিনগুলিকে বহস্যময় পরিপক্ক ফলের মতো সামনে হাজির করে। ন-মাসের অবর্ণনীয় কষ্টের পরে, শুধুমাত্র মুক্তি আর জীবনের নিরাপত্তার বিনিময়ে কঠিন সময় পেরিয়ে যাবার এত দৃঢ় মনোবল আর কখনো দেখিনি। তবু, ঠিক এরই মাঝখানে থেকে, যে বাংলাদেশ গঠন পেতে শুরু করে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধের লাল টকটকে রক্তে স্নাত বাংলাদেশ— হাজার বছরের বাঙালির স্বপ্ন বাংলাদেশে যখন সত্যিই বাস্তবে রূপ পেতে থাকে মায়াহীন, স্বপ্নহীন বাস্তবের রুক্ষ কঠিন জমি থেকে, তখন তার মধ্যেই দেখা দেয় যত্রতত্র চোরাবালি। সেকথা বলার লোক থাকলেও শোনার লোক ছিল না। কিংবা বলারও লোক ছিল না, শোনারও লোক ছিল না। এই অবস্থায় কোথাও এতটুকু দ্বিধা বা আপত্তি প্রকাশ করাটাও যেন একটা স্যাক্রিলেজ। তা যেন অসহ্য ঔদ্ধত্য, বিরক্তিকর বেয়াদপি। চিন্তা নয়, ভেসে যাওয়াটাই তখন বাংলাদেশ। জানি না কোথা থেকে ঠিক এই সময়টাতেই আমার মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এক অবিশ্বাসী, বেয়াদপ ভূশণ্ডি। মুক্তির আনন্দ মনের মধ্যে মিলিয়ে যাবার আগেই হিশেবনিকেশ শুরু হয়ে গেল। আমার গল্পের মুক্তিযোদ্ধা হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে করতে অশ্রুহীন চোখে তীব্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, 'আমারে কি কেউ দেখতি আইছিল?' বাংলাদেশের গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে উঠে আসা লাখ লাখ নিরক্ষর কৃষক মুক্তিযোদ্ধা যুবকদের পক্ষ থেকে এই কঠিন কৈফিয়তের প্রশ্ন 'আমারে কি কেউ দেখতি আইছিল?' তখন শহরের রাস্তায় উদ্দাম উৎসব। হাউই ফাটছে, রাইফেলের গুলি ছুটছে হিসহিসিয়ে বাতাস কেটে।

আমার ক্ষোভ ও রাগ প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। জমাট-বাঁধা অশ্রুর হিমশীতল পাথরের উপর দাঁড়িয়ে উৎসবের উল্লাস সইতে পারি না আর আমি। গল্পের মধ্যে তখন এই কাঁচা চিকিৎসাশাস্ত্রবিরোধী তথ্য দিয়ে বসি যে গ্যাংগ্রিন-আক্রান্ত পা কেটে ফেলার পরে মুক্তিযোদ্ধা ছেলেটি কাটা পা নিয়ে প্রলাপ বকে আর শেষ পর্যন্ত মারা যায়। আমাকে অনেক ডাক্তার বলেছেন, গ্যাংগ্রিন-এ যদি অপারেশন করে আক্রান্ত অংশ বাদ দেওয়া যায় তাহলে রোগী মারা যায় না। একথা জেনে আমার লজ্জা হয় না, কারণ, বাংলাদেশে

মরার জন্য কোনো কারণেরই দরকার হয় না। পরের গল্পেও আমার একইরকম ভুল হয়ে যায়, যুদ্ধফেরত মুক্তিযোদ্ধার মা বলে, একটুখানি জমি তাদের লাগবে আর একজোড়া বলদ। মুক্তিযুদ্ধের ন-মাসে তার স্ত্রী পালিয়েছিল ঘর ছেড়ে। সে কোন পথে কেমন করে পেটের ভাত জুটিয়েছে তা তার যুদ্ধফেরত স্বামী জানতে চায় না বটে, কিন্তু পেটে টান পড়লে আবার সে পালাবে কিনা জানতে চাওয়াটা তার পক্ষে জরুরি হয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধা এই কৃষক হাতের রাইফেল ফেরত দেয় না। বাড়ির পাশে ডোবার মাঝখানে ফেলে দেয় এই ভেবে যে ডোবাটা তেমন গভীর নয়, প্রয়োজনে অস্ত্রটা খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে না। দু-একজন মুক্তিযোদ্ধা পরে আমাকে বলেছেন, আগ্নেয়াস্ত্র মাসখানেক পুকুরের পানিতে ডুবে থাকলে চিরকালের জন্য অকেজো হয়ে যায়, এই খবরটি আমার জানা নেই। সত্যিই এ খবর আমার জানা ছিল না কিন্তু তাতে সত্যিই কী আসে যায়! অবশ্য পরের গল্পে আমার ভুল হয়নি। রামশরণ ছেলেমেয়ে স্ত্রী নিয়ে গাঁয়ে ফিরে নিজের ভিটে আর কোথাও খুঁজে পায় না। নিজেদের গাঁ-টাও চিনতে পারে না। পুরো গাঁ-টি মাটিতে মেশানো, কেউ সেখানে আসেনি, কোনো সন্দেহ থাকে না যে কেউ সেখানে কোনোকালে আসবে না। সফল মুক্তিযুদ্ধের পরে মানুষের অবিমিশ্র আনন্দে গিঁট দেবার চেষ্টা করে আমি সত্যিই ভালো করিনি। গোটা পৃথিবী যখন বাংলাদেশের আর্বিভাবে হুলুস্থুল করচে, অদৃষ্টপূর্ব উৎসাহে পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘন করতে প্রস্তুত হয়েছে, তখন এক নিরুদ্দিষ্ট বাংলাদেশের কথা আভাসে ইঙ্গিতেও আমার বলা উচিত হয়নি। মানচিত্রে জলজ্যান্ত বাংলাদেশ দপদপ করে জ্বলছে আর সেই বাংলাদেশকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছে মানুষ! ১৬ ডিসেম্বরের পরে ভারত থেকে ফিরে আসা নিরন্ন সর্বস্ব-খোয়ানো মানুষ স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে বাংলাদেশে খুঁজে মরছে; নেই, নেই তার কেউ নেই, কিছু নেই। ভিটেমাটি ঘরবাড়ি নেই, দিগন্ত থেকে দিগন্তে শুধু খুঁজে মরা, নেই, কোথাও নেই বাংলাদেশ। স্বপ্নের বাংলাদেশ নয়, ক্ষুধার অন্নের বাংলাদেশ, বিরামের ঘর-বাড়ির বাংলাদেশ, আবরণের বস্ত্রের বাংলাদেশ, বাস্তব বাংলাদেশ! সে কি উধাও হয়েছিল ১৬ ডিসেম্বরের পরে পরেই? আসতে-না-আসতে, দেখা দিতে-না-দিতে?

মুক্তিযুদ্ধে পাওয়া শরতের নির্মল ভোরের সূর্যের মতো রক্তে ডোবানো বাংলাদেশ কি বিজয়ের পরের দিন থেকেই পালাতে শুরু করেছিল? সে কি কেবলই পিছলে পিছলে সরে যাচ্ছিল? একথা বাহাত্তরের গোড়ায় যে বলতে পারে, এমনকী চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ-দুর্গতির দিনেও যে বলতে পারে, তাকে হঠকারীই বলা উচিত, কিন্তু আজ এই পঁচানব্বুই-এ সেই হঠকারী যে একটা তার বেসুরো বাজিয়েছিল সেজন্য তাকে দোষ দেওয়া কঠিন। বুকে থাপ্পড় মেরে গর্বের সঙ্গে ভাঙা দেয়ালের উপর মোরগের মতো ডানা ঝাপটে বলা যায় বইকী যে বাংলাদেশ তার যাত্রার শুরুতেই গণতন্ত্রের ধ্রুবপদ

বেঁধে নিয়েছে। গণতন্ত্রের লড়াই আমরা কখনো থামাইনি এবং সেই লড়াই আজও চলছে। পাকিস্তানিরা চব্বিশ বছরের শাসনে আমাদের একদিনের জন্যও গণতন্ত্র দেয়নি, পাকিস্তানের জন্মলগ্নেই গণতন্ত্র তার নাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, কোনো না কোনোভাবে সেনাবাহিনী ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছিল একটানা, এমনকী পশ্চিম পাকিস্তানই যখন গোটা পাকিস্তান হয়ে গেল তখনও তার গণতন্ত্র সহ্য হয়নি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ সম্বন্ধে কী বলা যাবে? মুক্তিযুদ্ধ পেরিয়ে-আসা বাংলাদেশ কেন বিজয়ের কমবেশি সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই পাকিস্তানি ঐতিহ্য-ই অনুসরণ করে বসল? আমাদের সেনাবাহিনীর নিম্নপদস্থ কয়েকজন অফিসার রাষ্ট্রপতি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করল, মুক্তিযুদ্ধের প্রধান নেতাদের অতি নৃশংসভাবে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিল। তবু নতুন শাসকদের কাছে তারা শাস্তি পেল না, পুরস্কারই পেল। এদের কেউ-কেউ ভয়াবহ ধরণের অপরাধী— স্মাগলার বা ডলার-ব্যবসায়ী বা দেশের অর্থ আত্মসাৎকারী—যত দিন যাচ্ছে ততই এসব প্রকাশ পাচ্ছে— এরা, অদ্ভুত ব্যাপার, উচ্চরাজপুরুষদের পদ পেতেই থাকল। গণতন্ত্রের লড়াইয়ে যাদের বিশ্বাস আছে, তারা কি কখনো এদের ক্ষমা করবে? না, যারা বন্দুকবাজি করে ক্ষমতা হস্তগত করে নিরাপদ গণতন্ত্রের চর্চা করে গেছে তাদেরই ক্ষমা করতে পারবে? স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে যে গণতন্ত্রের কথা আছে, তারই কথা মনে রেখে এই কথাগুলি বলছি। নব্বুই সাল পর্যন্ত বুলেট-ঘেরা এই গণতন্ত্রের মধ্যে আমাদের কেটে গেল। লাতিন আমেরিকার নিষ্ঠুর স্বৈরতন্ত্র নয়, বাংলাদেশের মোলায়েম গণতান্ত্রিক স্বৈরাচার। উৎখাত হবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত পার্লামেন্ট-টার্লামেন্টসহ অতি চমৎকার গণতন্ত্র। আমরা কাউকেই কিছু শেখাতে পারি না, একথা ঠিক নয়। এই বিচিত্র ককটেল-- গণতান্ত্রিক স্বৈরাচার— আমরা নিশ্চয়ই রপ্তানি করতে পারি। ক্ষমতাদখলের পিছনে সেনাবাহিনী আর বন্দুক আছে কিন্তু সাধারণভাবে রক্তপাত নেই। গণতন্ত্র উৎখাত করে নিরুপায় স্বৈরতন্ত্র। তারপর দেশের সম্পদ কব্জা-করা সেনাবহিনী থেকে দলে দলে অবসরপ্রাপ্তরা ব্যবসা-বাণিজ্যে নেমে আসে—এসবই অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় বইকী! কিন্তু এখন যে তার চেয়েও বড় কথা দাঁড়িয়ে গেছে। নব্বুই-এ স্বৈরাচারের পতন ঘটিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও বছর চারেক তার চর্চার পর আজ কারো কারো কাছে কি মনে হচ্ছে বর্তমান গণতন্ত্রের সঙ্গে তুলনায় স্বৈরাচার আর একটু গণতান্ত্রিক ছিল? সর্বনাশ! গণতন্ত্র কি এখন দশ দশায় এসে পৌঁছেছে?

এটা আমাদের গৌরবের কথাই বটে যে গণতন্ত্রকে আমরা কখনোই ফেলে দিতে পারিনি; কখনো ফেলে দেওয়া যাবেও না। রাষ্ট্রব্যবস্থায় কিছু ফল পেতে গেলে গণতন্ত্র থেকেই পেতে হবে, কিন্তু এই নির্মম সত্য কথাগুলিও মনে রাখা দরকার যে সবচেয়ে বড় আদর্শের স্লোগানগুলি গণতন্ত্রের মধ্যেই আউড়ে যাওয়া চলে, জনসাধারণের সর্বনাশ

চালিয়ে যেতে যেতেও জনগণের ক্ষমতার কথা নিয়ে গলা ফাটানো যায়। সত্যিই গণতন্ত্রের মতো এমন নির্দোষ নিরাপদ সর্বধারক স্থিতিস্থাপক পাত্র আর কোথায় পাওয়া যাবে? গণতন্ত্রের মধ্যেই কেবল একাত্তরের ঘাতক মৌলবাদী শক্তির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা যায়, বাংলাদেশের মৌলিক অস্তিত্ববিরোধী অনুশোচনাশূন্য অতি নিকৃষ্ট যুদ্ধাপরাধীটিকেও রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনা যায়, গণতন্ত্রের খাতিরেই মৌলবাদী উত্থানের সঙ্গে সহাবস্থান করা যায়, ভয়াবহ সন্ত্রাসকে গণতান্ত্রিকভাবেই জনগণের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া যায়। এক গণতন্ত্রেই কেবল চব্বিশ বছরের মধ্যে পাকিস্তানি কোটিপতিদের শূন্যস্থান মুক্তিযুদ্ধোত্তর হাজার হাজার কোটিপতিদের দিয়ে পূরণ করা যায়। শুধুমাত্র গণতন্ত্রের সাহায্য নিয়েই বাংলাদেশকে মৃতের বাংলাদেশে পরিণত করা যায়। এত অনাহার, এত অশিক্ষা, এত দারিদ্র্য, এত নিরাময়হীন ক্যানসার-আক্রান্ত অব্যবস্থা গণতন্ত্রের বিশাল উদর ছাড়া আর কোথায় জায়গা পেতে পারত? তবু গণতন্ত্রকে ছাড়া যাবে না। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের মতোই গণতন্ত্রকেও আমরা খুঁজে বেড়াব। এইজন্যই গণতন্ত্রকে আমরা ফেলতে পারিনি, কিন্তু সমাজতন্ত্রকে ধরতে-না-ধরতে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পেরেছি। আমাদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টির তারিফ না করে উপায় নেই যে, আন্তর্জাতিক বাজারে সমাজতন্ত্রের দর একেবারে তলানিতে এসে পৌঁছোনোর বহু আগেই আমরা বুঝে গিয়েছিলাম ও আর কানাকড়িতেও বিকোবে না। তবু একথাটা বুঝতে যে অতি অল্প সময় লেগেছিল তার মধ্যেই তড়িঘড়ি করে আমরা সমাজতন্ত্রের ইঞ্জিন চালিয়ে দিয়েছিলাম। আমরা ইতিহাসে বিশ্বাস করি না। আমাদের কাছে কোনোকিছুরই পূর্বাপর নেই। আমরা রেডি-মেড জিনিশ বাজারে ছাড়ি, আবার রেডি-মেড জিনিশই বাজার থেকে তুলে নিই। কেনই বা এক কথায় সমাজতন্ত্র চালু, কেনই বা এক কথায় সমাজতন্ত্রের বিদায়, তা কারো জানার উপায় নেই। জানাবার তোয়াক্কাও নেই। যে বিশ্বাস আর রাজনীতি নিয়ে শেখ মুজিবর রহমান নিহত হয়েছেন, একেবারে তার বিপরীত প্রান্তে অবস্থান নিয়ে কী করে তাঁর আদর্শেই চলছি বলা যেতে পারে, তা নিয়ে যেহেতু জিজ্ঞাসা নেই, কাজেই উত্তরও নেই। একটা চরম সুবিধাবাদী কথা 'রাজনীতিতে শেষ কথা নেই'— এটাই হতে পারে একমাত্র উত্তর। সমাজতন্ত্রকে বিদায় জানাবার সঙ্গে সঙ্গে তার যে একটা মূল কথা— মানুষের সঙ্গে মানুষের ভয়ানক বৈষম্য রাখা যাবে না— এই কথাটারও দায় থেকে মুক্তি পেতে গণতন্ত্রকে এখন অবাধ করা গেছে। পর্বতপ্রমাণ ধনসংগ্রহ, আকাশচুম্বী বিষমতা এখন সমাজের মধ্যে সত্যিই অবাধ। এটা যদি মুক্তিযুদ্ধবিরোধী না হয়, তা হলে কী যে মুক্তিযুদ্ধেবিরোধী তা আমার জানা নেই।

খুবই ভালো হয়েছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতাকে ছিবড়ের মতো দুর দুর করে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সত্যিই তো, এর চেয়ে পথের কাঁটা আর কী হতে পারে? নিজেদের বিবেচনাকে আমাদের ধন্যবাদ জানাতে হয় এইজন্য যে দুষ্ট লোকে ধর্মনিরপেক্ষতার

যে মানে করে অর্থাৎ রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্ম-বিবেচনা কোনো ভূমিকা নেবে না, ব্যক্তির ধর্মাচরণে রাষ্ট্র কখনোই হস্তক্ষেপ করবে না এবং ধর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি অনাগ্রহী উদাসীন থাকবে শুধু এই ছাড়া যে রাষ্ট্র কারো ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ সহ্য করবে না— সেখানে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ দাঁড়াল সকল ধর্মের পোষকতা করা। কাজেই সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মের ভূরি-পরিমাণ পোষকতা করা। এই পোষকতায় সত্যি সত্যিই ধর্মের পোষকতা হয়েছে কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কিন্তু এই পোষকতাকে যে ধনসম্পত্তি সংগ্রহ ও লুণ্ঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সমাজে ধনবান ও শক্তিমানদের প্রচুর কাজে আসছে তাতে সন্দেহ নেই। কাউকে কি মনে করিয়ে দিতে হবে পাঁচের দশকে 'ইভাকুয়িজ প্রপার্টি অ্যাক্ট' করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিপুল পরিমাণ সম্পদ-সম্পত্তি গ্রাসের সুযোগ বড়লোকদের করে দেওয়া হয়েছিল? পঁয়ষট্টির যুদ্ধের পরে শত্রু-সম্পত্তি আইন করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে সম্পত্তিগ্রাসের সেই প্রক্রিয়াকে আরো বেপরোয়া করে তোলা হয়। যে দেশে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আইন তৈরি করা হয়, রাষ্ট্র নিজে সংখ্যালঘুদের প্রকারান্তরে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে ঘোষণা দিয়ে দেয়, একেবারে মৌলিক অধিকারগুলিতে— যাকে বলে পেটে কিল মারা— হাত দেয়, সে দেশে সংখ্যালঘুদের দেশ ছাড়ে কেন জিজ্ঞেস করা একরকম বেহায়াপনাই বটে। কী আশ্চর্য, সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা গৃহীত হবার পরেও শত্রু-সম্পত্তি আইনের নতুন রূপ অর্পিত-সম্পত্তি আইন চালু থাকতে বাধা হয়নি। পাকিস্তানিরা, বিশেষ করে বিহারিরা যে সম্পত্তি ফেলে গিয়েছিল তার বিলিব্যবস্থা করার জন্য অর্পিত-সম্পত্তি আইনটির প্রয়োজন ছিল একথাটাকে যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয় বটে, কিন্তু স্বাধীনতার কয়েক বছরের মধ্যেই সেই পরিত্যক্ত বিশাল সম্পত্তি কীভাবে ভাগ-বাঁটোয়ারা, লুটপাট হয়ে গিয়েছিল তা আমরা সবাই জানি। মুক্তিযুদ্ধে যে বাংলাদেশের হাজার হাজার কৃষক, শ্রমিক আর নানা শ্রমজীবী মানুষ অংশ নিয়েছিল, সেকথাটা কিছুদিনের জন্য ভুলে যাবার প্রয়োজন হয়েছিল। মনে হতে পারত, হাঘরে শহুরে মধ্যবিত্তই বুঝি মুক্তিযুদ্ধ করেছে এবং তাদের বাড়ির খিদে, সম্পত্তির খিদে, লুটপাটের খিদে মেটানোই মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের একমাত্র কাজ। অর্পিত-সম্পত্তি আইন মেনে বা তাকে কলা দেখিয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে যাবতীয় অর্পিত সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা হয়েছিল। তখন কিছুদিনের জন্য বাঙালি সংস্কৃতি বিহারি রান্নাঘর, বিহারি ড্রয়িংরুম, বিহারি আসবাবপত্রের সামনে গিয়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যুদ্ধফেরত উঠতি মধ্যবিত্তশ্রেণীর পরিপাকশক্তি খুব খারাপ ছিল না। সে যাই হোক, অর্পিত-সম্পত্তি আইনের প্রয়োজন বহু আগেই ফুরিয়েছে, কিন্তু তা যে এখন রয়ে গেছে সেটা মোটেই পাকিস্তানি ও বিহারিদের জন্য নয়। এই কামান এখন ঘুরিয়ে ধরা হয়েছে দেশের সবচেয়ে বড় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দিকে। গ্রামাঞ্চলে এই আইনের ঢাল ব্যবহার

করে কী যে তাণ্ডব চালানো হচ্ছে সরকার তা জানে না বলতে পারে না। কারণ সরকার সবজান্তা। তবু আইনটি এখনও চালু রয়েছে।*

দেখা যায়, রাষ্ট্রের ধর্মপোষকতার সঙ্গে ধর্মের বিন্দুমাত্র যোগ নেই, যোগ আছে লুটের। সেজন্য নাম-কা-ওয়াস্তে ধর্মনিরপেক্ষতা রাখার চাইতে ও বালাই দূর করে সংবিধানের মাথায় ধর্মীয় বাণী খোদিত রাখাই ভালো। তখন আমরা শিখে ফেলি সাম্প্রদায়িকতার জন্য কেমন করে মুখিয়ে থাকতে হয় আর বাবরি-মসজিদ বা এইরকম কোনো জঘন্য সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার উপলক্ষ পেলেই প্রচণ্ডবেগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর কীরকম করে হামলা চালাতে হয়। আসলে দেশে যে নির্বিচার সম্পদলুণ্ঠন ও সংগ্রহ চলেছে, আইনের কাঠামো, বাজারের কাঠামো, রাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থার কাঠামো ভেঙে চুরমার করে যে দানবীয় শোষণ-প্রক্রিয়া এখন চালু রয়েছে, তারই আর একটা নতুন মাত্রা তৈরি করেছে সাম্প্রদায়িকতা আর মৌলবাদ।

বাকি রইল আর একটি স্তম্ভ— জাতীয়তাবাদ। ইতিহাসের পথ প্যাঁচালো। ইতিহাসে জাতীয়তাবাদের পথও প্যাঁচালো। অবিকল দুটি একরকম জাতীয়তাবাদ কখনো দেখা যায়নি। উগ্র অত্যুগ্র যে বিশেষণই লাগানো হোক না কেন, জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব বহুবর্ণিলই বটে। আমার ধারণা বাঙালি হবার জন্য বাঙালি জাতীয়তাবাদের খুবই প্রয়োজন ছিল। ওই তত্ত্ব দিয়েই আমারা পাকিস্তানি শোষণের চেহারাটা বোঝাতে পেরেছিলাম। ওই তত্ত্ব দিয়েই প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছিল যে ধর্মের নীচে নয়, উপরে শোষণের স্থান। শোষণই সেই বহু হস্তপদবিশিষ্ট জলজন্তু লেভিয়াথান যা ধর্মকে নিজের অধীনস্থ করে ব্যবহার করতে পারে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের নিজস্ব তাত্ত্বিক ব্যবহার কেমন হতে পারে আমরা জানা নেই। কিন্তু প্রবল প্রতিক্রিয়া হিশেবে আন্দোলনে-সংগ্রামে তার কী ইতিবাচক ভূমিকা থাকতে পারে তা আমরা সবাই জানি। কাজেই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বলে, এমনকী একটা সাবানের বুদবুদ বিদ্যমান না থাকলেও, বাঙালি জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে পাকিস্তানিরা যা বলতে পারত, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ঠিক তাই। পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ছিল না, কারণ বাংলাদেশই ছিল না, কিন্তু 'পাক-বাংলার কালচার', 'ইসলামাইজেশন', 'পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ' ইত্যাদি লব্জ তখনও ছিল, যদিও পশ্চিমপাকিস্তানে চার-চারটি জাতি থাকার ফলে পাকিস্তানিরা এ বিষয়ে বেশি উচ্চবাচ্য করেনি। কিন্তু এখন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ নিয়ে শোরগোল তোলার লোকের অভাব নেই। আমার ধারণা, বাংলাদেশকে একটি সতেজ স্বাস্থ্যের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিশেবে দাঁড় করিয়ে দিতে পারলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটু ক্রুদ্ধ,

*সম্প্রতি অবশ্য এই আইনটি রদ করার কথা চলছে। স.।

একটু অসহিষ্ণু ভূমিকার ইতি ঘটত। ইংরেজকে ইংরেজ হবার জন্য রাতদিন ব্রিটিশ জাতীয়তাবাদ বা জার্মানকে জার্মান হবার জন্য জার্মান জাতীয়তাবাদ বলে কয়ে চর্চা করতে হয় না। ইংরেজ স্বাভাবিক ইংরেজ হয়েই গড়ে ওঠে, বাঙালিও তেমনি হত স্বাভাবিক বাঙালি, রাতদিন বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভজার তার দরকার হত না। কিন্তু বাংলাদেশে এখন স্বাভাবিক বাঙালি হবার রাস্তা নেই, বাঙালি বলতে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেওয়া হয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে। স্বাভাবিক বাঙালিকে স্বাভাবিকের পথ থেকে সরিয়ে এনে উদ্ভট এক মানুষ বানিয়ে তোলার জন্যই তুলে ধরা হচ্ছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। স্বাভাবিকের পথটাকে খোলা রাখার জন্যই প্রয়োজন বাঙালি জাতীয়তাবাদ।

কাগজে দেশ থাকে না। মানচিত্রে দেশের অবস্থানটুকুই পাই। তার বেশি আর কী! দেশের বাইরে যারা থাকে, মানচিত্র আর সংবিধান থেকে দেশের কী তারা জানে? বড় জোর একটা আলগোছ বিমূর্ত ধারণা। দেশ থাকে দেশের মধ্যে যারা বসবাস করে তাদের দিনের-দিনের জীবনে। পৃথিবীর সমস্ত বিদেশী কী জানবে বাংলাদেশ সম্বন্ধে? বাংলাদেশ ছেড়ে চলে গেছে যেসব বাঙালি, বাংলাদেশের জন্য বিলাসী উপদেশ ছাড়া আর কী দিতে পারে তারা? কিন্তু বাংলাদেশের একজন লেখক খুঁজে বেড়াবে কোন বাংলাদেশ? কাগজে আর দলিলে, রিপোর্টে, পরিসংখ্যানে, সংবিধানে আর বিদেশীদের কাছ থেকে যা জানা যায়, লেখকের কাছে তার মূল্য কী? রান্নার রেসিপি জেনে নিয়ে মনে মনে রান্না করে তার স্বাদগ্রহণে খাদ্যরসিক যে তৃপ্তি পায়, তার বেশি কিছু কি?

একগাদা কথা লিখে আজকের বাংলাদেশ কেমন তার কিছুই কি বোঝানো গেছে? কাগজের বাংলাদেশ কাগজের মতোই শুকনো চরচরে নীরক্ত শাদা। তাতে তর্ক, যুক্তি, রাজনীতির ফাঁকা বুলি, দর্প, দম্ভ, লোভ, চালাকি আর শুধুই ঝকঝকে হিংস্র শাদা দাঁত। এই বাংলাদেশ নিয়ে লেখক কাজ করতে পারেন না। তাঁকে তাহলে কেবলই হিশেব করতে হবে, দল ধরতে হবে, ঝুলে পড়তে হবে; মুখে জুতো-তুলে-নেওয়া শাসকের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও মুখে জুতো তুলে নিতে হবে আর কলম উঁচিয়ে মাঝে মাঝেই দেখে নিতে হবে নাকের সামনে থেকে কিছু যেন সরে যেতে না পারে; রিকশা হোক, মোটরগাড়ি হোক, ট্রেন হোক, বিমান হোক, ঠিক ঠিক ধরে ফেলা চাই। লেখকের বাংলাদেশ তো এইসবে নেই। আছে তাঁর রক্তের কণিকায় কণিকায়। বাংলাদেশ তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষের স্মৃতি নয়। বাংলাদেশ তাঁর কাছে গোটা পৃথিবী, আর হয়তো গোটা পৃথিবীই তাঁর কাছে বাংলাদেশ। এই অতিপ্রত্যক্ষের তীব্রতার হাত থেকে কে তাঁকে বাঁচাবে? কে দিতে পারবে স্তোক আর সান্ত্বনা? সে সাধ্য কোন ক্ষমতাবানের আছে? বাংলাদেশ—গভীর অন্ধকারে তার ভাঙনের শব্দ, ধস নামার গম্ভীর ধুপধাপ আওয়াজ;

ধস নামছে বিক্রমপুরে, ঢাকায়, মানিকগঞ্জে, তিতাসের তীরে, কর্ণফুলীতে, সিলেটে সুরমায়, টাঙ্গাইলে ভুয়াপুরে, গাইবান্ধায়, তিস্তার পাড়ে, রংপুরে, যমুনায়, সিরাজগঞ্জে—অন্ধকারে, ক্রমাগত ধস নামছে, ছোট হয়ে আসছে বাংলাদেশ, অন্ধকারে, বাতাসের ঝড়ের ঝাপটে জাহাজ ডুবে যাচ্ছে শীতলক্ষ্যায়, ঢাকার সবচেয়ে দীর্ঘ দালানের চূড়াটিও অদৃশ্য হচ্ছে আর ওদিকে উজাড় হয়ে যাচ্ছে সুন্দরবন, চিংড়ি-ডলারের জন্য বন্দুকের নির্দেশে লোনা পানি উঁচু হয়ে আসে, খালপাড়ে রক্তের লবণ লাল টকটকে হয়ে ছড়িয়ে যায়, সমস্ত সুন্দরী গেউয়া মরে যায়, মুমূর্ষু কুকুরের মতো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার কেঁউ কেঁউ করে ডাকে, আবার উত্তরের মাটির নীচে থেকে পানি সরে যায়, বিশাল বিশাল ফাটল দেখা দেয় প্রসূতি বাংলাদেশের তলপেটে, বাংলাদেশের মাটির এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত, মাটির উপরে ক্রমাগত বালিয়াড়ি এগিয়ে আসে। এইসব, এইসব কী বীভৎস বর্ণনা, না বীভৎস বাস্তব!

কাকে আমৃত্যু বয়ে বেড়াতে হবে এই যন্ত্রণা?